ব্রিটিশ রাজত্বে
সুন্দরবন

শশাঙ্ক মণ্ডল

পুনশ্চ

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	ব্রিটিশ রাজত্বে সুন্দরবন	৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	নদনদী পরিবহন যোগাযোগ	১৯
তৃতীয় অধ্যায়	শিল্প-বাণিজ্য	৪৮
চতুর্থ অধ্যায়	কৃষি ও কৃষক	৮৬
পঞ্চম অধ্যায়	শিক্ষা	১২৯
ষষ্ঠ অধ্যায়	লৌকিক দেবদেবী পির গাজিদের কথা	১৪০
সপ্তম অধ্যায়	সুন্দরবনের আঞ্চলিক ভাষা	১৯৬

ব্রিটিশ রাজত্বে সুন্দরবন

প্রথম অধ্যায়

রাষ্ট্রীয় ব্যবচ্ছেদে সুন্দরবনের এলাকা খর্বীকৃত হয়ে আজকের সীমা এসে দাঁড়িয়েছে ১৫টি থানা নিয়ে উত্তর-দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ডহারবার, আলিপুর ও বসিরহাট মহকুমার দক্ষিণের ৪৫ লক্ষ মানুষের বাসভূমি। নদী-দ্বীপ-জলজঙ্গলে ভরা এই অঞ্চলের বর্তমান আয়তন ৯৬৫০ বর্গ কিলোমিটার, তার মধ্যে মনুষ্য বসতি ৪৫০০ বর্গ কিলোমিটার ৫৪টি দ্বীপ নিয়ে। কিন্তু ব্রিটিশ রাজত্বের শুরুতে ২৪ পরগনার দক্ষিণের এই বিস্তীর্ণ এলাকা ছাড়াও বর্তমান বাংলাদেশের খুলনা, বাখরগঞ্জ, যশোরের দক্ষিণাংশ জুড়ে ছিল সুন্দরবন। কলকাতার সন্নিকটবর্তী দমদম সেদিন ছিল সুন্দরবনের অভ্যন্তরে। লর্ড ক্লাইভের দমদমের বাড়ি প্রসঙ্গে সে যুগের বিবরণীতে সুন্দরবনের অভ্যন্তরে তার স্থান নির্দেশ করা হয়েছে। ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে ফৌজি কর্তৃপক্ষ দমদম ক্যান্টনমেন্টের সম্প্রসারণ করার জন্য সরকারের কাছে অতিরিক্ত জমির আবেদন জানাচ্ছেন—সরকারের পক্ষ থেকে সুন্দরবন কমিশনারকে তা বিবেচনা করার জন্য বলা হচ্ছে।[১] কতিপয় ব্যবসায়ী সল্টলেকের জমি মাছ চাষের কাজে লাগাতে চেয়ে সুন্দরবন কমিশনারের কাছে আবেদন করছে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে দক্ষিণ বাংলার এক বিস্তীর্ণ এলাকা জনবসতিশূন্য হয়ে পড়ে—আজকের ২৪ পরগনা, খুলনা, যশোরের দক্ষিণাংশ এবং বরিশাল বাখরগঞ্জের একটি বড়ো অংশ সেদিন এই এলাকার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং বিদেশি পর্যটকদের বিবরণীতে সুন্দরবন নামে তা পরিচিত হচ্ছে। এ সময়ের বিভিন্ন পর্যটকের বর্ণনায় এই অঞ্চল জনবসতিশূন্য বনাঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল; এমনকি 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' সমগ্র বাংলাদেশে চালু করা হলেও সুন্দরবনের ক্ষেত্রে তা শুরুতে করা হয়নি। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে সরকারি সার্ভে অনুযায়ী সুন্দরবনের উত্তর সীমা নির্ধারিত হল যমুনা নদী। In 1813 the Govt. Survey fixed the Jamuna as the northern boundary of the Sundarbans. —James Long : Banks of Bhagirathi.

উনিশ শতকের শেষেও পশ্চিমে হুগলি নদী, পূর্বে মেঘনা মধ্যবর্তী গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র বিধৌত সমভূমি সুন্দরবন নামে পরিচিত ছিল।[২] সুন্দরবন নামটি ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিভিন্ন বিদেশি পর্যটকদের বিবরণীতে পাওয়া যাচ্ছে। পূর্বে এই এলাকা 'ভাটি' নামে পরিচিত ছিল। বারো ভাটির দেশ, বারোজন রাজার অধীনে ছিল এই এলাকা। কবিতায় লক্ষ করা যাচ্ছে—'ভাটি হইতে আইল বাঙাল লম্বা লম্বা দাড়ি।'

মোগলদের কাছে দক্ষিণ বাংলার এই অঞ্চল বুল্‌গাখানা—বিদ্রোহীদের আস্তানা। পরিপূর্ণ রূপে সমগ্র এলাকা কখনোই মোগল অধিকারে আসেনি। *আইন-ই-আকবরী*তে উল্লেখ করা হয়েছে—Easan Afgan carried his conquests towards east into a country called Bhatty which is reckoned a part of this Subha-Bengal. সাতগাঁ সরকারের অধীন সুন্দরবনের এক বিশাল এলাকা ছিল সেদিন।[৩] ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে টোডরমল বাংলাদেশ জরিপ করে রাজস্ব নির্ধারণ করেন। মেদিনীপুরের হিজলি থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকের সমতলভূমির নাম ছিল ভাটি।

১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ পুনরায় জরিপ করা হল সাজাহান পুত্র সুলতান সুজার নেতৃত্বে—এই জরিপে সুন্দরবন চিহ্নিত হল মুরাদখানা বা জিরৎখানা হিসাবে।[৪] মামুদ শাহের রাজত্বকালে নবাব জাফর খাঁর নেতৃত্বে তৃতীয়বারের মতো জরিপ করা হল। সুন্দরবনকে কয়েকটি পরগনার মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেল। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য—নিমক মহল, জঙ্গলমহল, বালিয়া, বালান্দা, সরফরাজপুর, আমিরাবাদ, পাইহাটি, মাইহাটি, মদনমল্ল, হাতিয়াগড়, সাগর, খাসপুর ইত্যাদি। মিরকাশিমের রাজত্বকালে চতুর্থবার বাংলাদেশ জরিপ করা হল ১৭৬১-৬২ খ্রিস্টাব্দে। সুন্দরবন কাঠ, মোম, মধু, লবণ ও চুন সংগ্রহের একটা বড়ো স্থান হিসাবে বিবেচিত হল এবং সুন্দরবনের আর্থিক সম্পদের দিকে সরকারের দৃষ্টি নিবদ্ধ হল।

কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে সুন্দরবনের একটা বিস্তীর্ণ এলাকা জনবসতিশূন্য হয়ে যায়—এর পিছনে কারণ হিসেবে বলা হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মগজলদস্যুদের বারংবার আক্রমণ। মগজলদস্যুদের উৎপাত সুন্দরবনের বিভিন্ন নদীতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। পরবর্তীকালে উনিশ শতকের শুরুতে তা বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় সাগর দ্বীপ উঠিত করার সময় দেখা যাচ্ছে সমস্ত এলাকাটাই বনভূমি কিন্তু সমুদ্র তীরবর্তী এক হাজার বিঘার মতো জমিতে মানুষের অস্থায়ী ভাবে বসবাসের চিহ্ন রয়েছে।[৫] তা থেকে অনুমান করা হল মগজলদসুরা মাঝে মাঝে এখানে আস্তানা তৈরি করে আবার প্রয়োজনমতো অন্যত্র চলে যেত। মগজলদসুদের অত্যাচার, প্রাকৃতিক দুর্যোগ জনবসতি লোপ পাবার কারণ হতে পারে কিন্তু আর একটা প্রধান কারণের কথা উল্লেখ করেছেন ভৌগোলিকরা। গঙ্গার প্রধান জলধারা বিগত দুই-তিন শতাব্দী ধরে প্রতিনিয়ত পশ্চিম থেকে পূর্বের দিকে সরে যাচ্ছে। যার ফলে সুন্দরবনের পশ্চিমদিকের নদীর জল লবণাক্ত হচ্ছে—লবণাক্ত জলের চাপে সুন্দরবনের এই অংশে শস্যহানি ঘটতে থাকায় জনবসতি শূন্য হয়ে বনভূমিতে পরিণত হয়।

ভাটিদেশের সুন্দরবন নামে পরিচিত হবার পিছনের কারণ নানাভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে। অনেকে সুন্দরবন নামটির উৎপত্তির কারণ হিসাবে সুন্দরবনের সুন্দরী গাছের কথা উল্লেখ করেছেন। সুন্দরবনের জঙ্গলে বিভিন্ন ধরনের গাছ জন্মে—বান, কেওড়া, গরান, হোগলা, গোল এধরনের অসংখ্য গাছ সুন্দরবনের মধ্যে লক্ষ করা

যায়। এসব গাছের মধ্যে সুন্দরী গাছ খুবই মূল্যবান। সুন্দরী কাঠ পালিশের পক্ষে খুবই উপযুক্ত হওয়ায় এর কাঠ থেকে নৌকা তৈরি করা হয়। অপেক্ষাকৃত কম লবণাক্ত জঙ্গলে এই গাছ বেশি জন্মে। আজকের সুন্দরবনের জঙ্গলে সুন্দরী গাছ খুবই বিরল। সুন্দরীগাছের বন থেকে সুন্দরবন—এটা সঠিক নয়। অনেকে সমুদ্রতীরবর্তী বন থেকে সুন্দরবন তার থেকে সুন্দরবন এই মনে করেন। যে বন দেখতে সুন্দর তাকে সুন্দরবন হিসাবে ভাবা হয়েছে। বিশাল নদীর দুই তীরের সীমাহীন সবুজ অরণ্যের নয়নমনোহর দৃশ্য যে কোনো মানুষকে মুগ্ধ করবে। বিভিন্ন বিদেশি পর্যটকদের কাছে সুন্দরবনের এই শ্যামশ্রী তার নয়নমনোহারী দৃশ্য বারবার ধরা পড়েছে। সুতরাং সেই অর্থে সমুদ্রতীরবর্তী সুন্দর মনোহারী বন সুন্দরবন নামে পরবর্তীকালে পরিচিত হয়েছে।

সুন্দরবনকে নিয়ে ব্রিটিশ আমলের শুরু থেকে প্রায় একশো বছর ধরে প্রতিনিয়ত সরকার চেষ্টা করেছে—বেশি বেশি করে এর সম্পদকে নিজস্ব অধিকারে নিয়ে আসতে। ভূমি রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে নানারকম পরিকল্পনা কোম্পানির পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যশোরের জজ ও কালেক্টর টিলম্যান হেঙ্কেল সাহেব খুলনা যশোর ২৪ পরগনা অংশের পূর্বে হরিণঘাটা নদীতীর থেকে পশ্চিমে রায়মঙ্গল বরাবর বিশাল ভূখণ্ড ১৪৪টি লটে বিভাগ করে ৬৪৯২৮ বিঘা জমি রায়তদের মধ্যে বিলি করার ব্যবস্থা করেন। কোম্পানির আশা ছিল রায়তরা নিজেদের জমি বন কেটে চাষযোগ্য করে নেবে। তার ফলে সমগ্র এলাকা জনবসতিপূর্ণ হয়ে উঠবে। মোগলযুগের মতো আবার এই এলাকায় কৃষিসমৃদ্ধি দেখা দেবে—the former prosperity of cultivation of the Sundarbans during Mughal Empire—আবার ফিরে আসবে। হেঙ্কেলের তালুকে দু'বছরের জন্য খাজনা মকুবের ব্যবস্থা রাখা হল—পরবর্তীকালে উৎপাদনের পরিমাণ বিবেচনা করে খাজনা ধার্য করার কথা চিন্তা করা হল। কিন্তু এই পরিকল্পনায় বাধা হয়ে দাঁড়াল উত্তরের লিজ প্রাপ্ত জমিদাররা। সুন্দরবনের এই জমি তাদের এলাকাভুক্ত বলে দাবি জানাতে লাগল। তাদের দাবি অনেক সময় দক্ষিণের সমুদ্রতীর পর্যন্ত। হেঙ্কেল সাহেব বাঁশগাড়ি করে বেশ কিছু এলাকা পুরোনো জমিদারদের সাথে নতুন জমিদারদের সীমা চিহ্নিত করে দিলেন কিন্তু বিরোধ কমল না; অসংখ্য মামলা শুরু হল।

১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে নদীয়ার রাজা হিঙ্গলগঞ্জ তার এলাকাভুক্ত বলে কোর্টে কেস শুরু করেন। মামলার রায়ে রাজা হেরে গেলেন ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে এবং ঐ জমি সরকারের খাস জমি বলে স্বীকৃত হল। প্রতিনিয়ত বিরোধ লেগে থাকল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে যে সব জমিদার সুন্দরবনে উত্তরাংশে অধিকার পেলেন তাদের সাথে সরকারের। প্রত্যেক জমিদার যে যতটা পারল দক্ষিণের বনভূমি তার এলাকা বলে দাবি জানাতে থাকল। সরকারের সামনে সুন্দরবনের জমি জরিপের প্রশ্নটা জরুরি হয়ে দেখা দিল।

১৮১১-১৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে W. E. Morison হুগলি থেকে পশর নদীর মধ্যবর্তী সুন্দরবনের জমি মাপ করেন এবং ভুলত্রুটির সংশোধনের দায়িত্ব পান পরবর্তীকালে তাঁর ভাই Hugh Morison ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে। ২৪ পরগনার সহকারী কালেক্টর মিঃ স্কটের উপর নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া হল সুন্দরবনের জমি চাষযোগ্য করার এবং জমিদারদের ইচ্ছামতো সুন্দরবনের জমি জোর করে নিজেদের এলাকার মধ্যে দাবি করার প্রবণতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার আইনি ক্ষমতা সরকারের পক্ষ থেকে তার উপর অর্পণ করা হল। জমির খাজনার ব্যাপারে বোর্ড অব রেভিনিউ নির্দেশ দিলেন—জমি উঠিত-এর ৭ বছর পরে বিঘা প্রতি আট আনা খাজনা, ৬ বছর পূর্ণ হলে বিঘা প্রতি তিন আনা—এ ধরনের খাজনার হিসাব জানিয়ে দেওয়া হল। এর সাথে সমস্ত সুন্দরবন নিকটবর্তী জমিদারদের জমির সীমা অর্থাৎ স্বত্বের অধিকার প্রমাণ করতে হবে মিঃ স্কটের কাছে। ইতিমধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে সুন্দরবনের সমগ্র জমির তদারকির দায়িত্ব দেওয়া হল সুন্দরবন কমিশনার পদ সৃষ্টি করে। ১৮১৪-এর নবম রেগুলেশনের মাধ্যমে মিঃ স্কটকে প্রথম কমিশনার করা হল।[৭] কিন্তু সীমানা নিয়ে বিরোধ থেকে গেল। সুন্দরবন কমিশনার হিসাবে মিঃ ডেল দায়িত্ব নিলেন—মিঃ প্রিন্সেপকে এ সময়ে সার্ভেয়ার হিসাবে নিয়োগ করা হল। সুন্দরবন কমিশনারের এলাকার সঙ্গে আরও ২১টি পরগনা যুক্ত করা হল। প্রিন্সেপ-এর নেতৃত্বে ১৮০ মাইল পরিমাপ করা হল যমুনা নদীর পরানপুর থেকে হুগলি পর্যন্ত। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে নতুন আইন করে বিরোধের সমস্ত ফাঁকফোকড় বন্ধ করে সরকার সুন্দরবনের সমগ্র বনভূমি নিজ অধিকারে নিয়ে আসেন এবং প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি বিলি করা হতে লাগল। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে দেখা গেল বরিশাল খুলনা ২৪ পরগনা যশোরের জঙ্গল কেটে সাফ করা হয়েছে, সামান্য বনভূমি ১৬০০ বর্গ-মাইল তখন অরণ্য হিসাবে স্বীকৃত হল।

সুন্দরবন এলাকায় বর্তমান জনবসতি শুরু হয়েছে উনিশ শতকের প্রথমের দিকে, অবশ্য সুন্দরবনের উত্তরাংশে দীর্ঘকালের বাসিন্দারা ১০-১৫ পুরুষ ধরে বসবাস করছেন তা লক্ষ করা যাচ্ছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেও এক বিস্তীর্ণ এলাকায় কোনো বসতি ছিল না। তাই সে যুগের রচিত মানচিত্রগুলিতে এই এলাকার উল্লেখ করা হয়েছে—Depopulated by Mugs. সেদিন সুন্দরবন ছিল পরিত্যক্ত জনবসতিশূন্য জঙ্গলমহল নিমকমহল।

লবণ কাঠ মোম মধু চুনের প্রয়োজনে কিছু মানুষ এসব এলাকায় যাতায়াত করত। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের পর কোম্পানির চর বন্দোবস্তের মাধ্যমে নতুন নতুন ইজারাদারদের জমি বন্দোবস্ত দিলেন। জীবিকার প্রয়োজনে একদিন যারা ছিল লবণ শিল্পের শ্রমিক, মাহিন্দার, কাঠুরিয়া কিংবা চুনের জন্য শামুক সংগ্রহকারী তারা ইজারাদারদের নির্দেশমতো জমি উদ্ধারে যোগ দিল। উত্তরের মানুষ দক্ষিণের দিকে যাত্রা শুরু করল। সাঁওতাল পরগনা, রাঁচি এলাকার অনেক আদিবাসী বন কাটার কাজে অংশ নিল। আর

উত্তরের দিকে নীলের শ্রমিক হিসাবে অনেক আদিবাসীকে নীলকর সাহেবরা এসব এলাকায় নিয়ে আসেন। এসব মানুষদের বংশধররা আজও এ অঞ্চলে বসবাস করছে। সাঁওতাল বিদ্রোহের পরবর্তীকালে আদিবাসীদের আসবার প্রবণতা বেড়ে গিয়েছিল। ইংরাজ সরকার সেদিন সিদ্ধান্ত করেছিল—আদিবাসীদের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনকে ভেঙে দিতে হবে। এরই পাশাপাশি ২৪ পরগনা খুলনা যশোর নদীয়া বাখরগঞ্জ জেলার উত্তরাংশের অনেক মানুষ জমির লোভে ফসলের আকর্ষণে সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় ঢুকে পড়ল। এসব এলাকার কুটির শিল্পীরা ইংরেজের শিল্প-বাণিজ্য নীতির ফলে জীবিকাচ্যুত হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাধ্য হয়েছে সুন্দরবনে গিয়ে চাষের কাজে নিয়োজিত হতে। নতুন এসব জমিদারিতে কামার কুমোর প্রভৃতি বিভিন্ন পেশার মানুষদের আকৃষ্ট করে নিয়ে গেছে জমিদাররা। "খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, বাঁধাল বিপদ এঁড়ে গোরু কিনে"—এ প্রবাদটি এই ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

ইংরাজ রাজত্বে বিভিন্ন সময়ে প্রজাবিদ্রোহ ঘটেছে, তা ইংরাজের দানবীয় অত্যাচারে দমন করা হয়েছে। অত্যাচারিত মানুষগুলি পুরোনো আশ্রয় ফেলে সুন্দরবনের নব উঠিত ভূমিকে নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল হিসাবে বেছে নিয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে। ১৮৩১-এর পর তিতুমিরের অনেক শিষ্য সরফরাজপুর কুশদহ পরগনা থেকে সুন্দরবনের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছে, তাদের বংশধররা সুন্দরবনের বিভিন্ন থানায় এখনও বসবাস করছে। ফরাজি আন্দোলন পরবর্তীকালে অনেক মানুষ খুলনা বরিশালের দক্ষিণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। এর সাথে সামাজিক অপরাধীরা, মগজলদস্যুরা সুন্দরবনের বিভিন্নপ্রান্তে নিরাপদ ভূমি হিসাবে বসবাস শুরু করে। মেদিনীপুরের ভয়ংকর বন্যা বাধ্য করেছিল অনেক মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে সুন্দরবনে এসে বসতি গড়ে তুলতে; স্থানীয় মানুষের কাছে এখনও এরা ভাসা নামে পরিচিত হতে বাধ্য হয়েছে। এককথায় বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন কারণে সুন্দরবনের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়েছে—সকলকে ঠাঁই দিয়ে ব্রিটিশ রাজত্বে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের মধ্যে সুন্দরবন এক বিশাল ভূখণ্ড হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

অনেকে বলার চেষ্টা করেছেন ব্রিটিশযুগে সুন্দরবনের দক্ষিণের যে স্থানগুলিতে নতুনভাবে বসবাস শুরু হল তা নবসৃষ্ট ভূমি। উনিশ শতকের পূর্বে সেখানে কোনো মনুষ্য বসবাসের চিহ্ন ছিল না। ভৌগোলিকরা বলেছেন—নদীর জোয়ারের জল অতি সহজে পার্শ্ববর্তী এলাকাকে প্লাবিত করতে পারে। জমি পলি পড়ে উঁচু হবার আগেই বসতি তৈরি হয়েছে—সেজন্য বাঁধ দিতে হচ্ছে—এসব এলাকা নবসৃষ্ট ভূমি; গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের পলিতে গঠিত—ইংরাজ রাজত্বের পূর্বে সভ্যতার কোনো চিহ্ন ছিল না।

কিন্তু বিভিন্ন স্থানে প্রতিনিয়ত প্রত্নসামগ্রী আবিষ্কার এই কথাই প্রমাণ করে প্রাচীন সভ্যতা কৃষ্টির উত্তরাধিকার নিয়ে সুন্দরবনের এক বিশাল এলাকা এখনও তার অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে। অতীত হাত বাড়ায় বর্তমানের দিকে; অতীতের সঙ্গে বর্তমান একই